শেষ হওয়ার পরে

নীলাদ্রি মুখার্জী

শব্দ প্রকাশন

মুখবন্ধ

ঠিক কতদিন হয়েছে খেয়াল নেই, ঠিক কতদিন টাইপ করে কোন গল্প লিখিনি তারও হিসাব নেই। 'গ্রন্থকীট' লেখার পর যে দু-তিনটে পুজোবার্ষিকীতে লিখতাম তারাও একদিন তিতিবিরক্ত হয়ে লেখা চাওয়া বন্ধ করে দিল। আমি তাদের জায়গায় থাকলে আরও আগে যোগাযোগ বন্ধ করে দিতাম। তবে রয়ে গেছিল শুধু নভোরজ পত্রিকা এবং এই বইয়ের প্রকাশনা সংস্থা।

আমার মতো কথার খেলাপী এবং নেহাতই দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষের জন্য অপেক্ষা করাটাই বোকামি, কিন্তু ওই যে বলে বোকা মানুষ জগতে না থাকলে আমার মতন অতিচালাকদের খুব সমস্যা হয়ে যেত। কাজেই লেখালেখিতে ফেরা অনেক টালবাহানার পর।

এই বইটি যদি বইমেলা ২০২৩ এ প্রকাশিত হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এক অসাধ্য সাধন করেছেন শব্দ প্রকাশন কর্তৃপক্ষ। আমি যে সময়ে পান্ডুলিপি জমা করেছি সেই সময় থেকে নিয়ে বইমেলা শুরু হওয়া পর্যন্ত যে সময় পাওয়া যায় তাতে নিখুঁতভাবে কোন লেখাকে জনতার দরবারে নিয়ে যেতে গেলে যে পরিশ্রম প্রয়োজন তা হয়তো খানিকটা আমি বুঝতে পারি। কাজেই আমার পীড়াপিড়িতে বইমেলায় বইটি প্রকাশ হলে তার মুদ্রণ প্রমাদ এবং অন্যান্য কারিগরি ত্রুটির দায় একান্তই আমার, প্রকাশনা সংস্থার নয়।

কবীর নিয়ে আর কোনোদিন লেখার কোনো ইচ্ছেই আমার ছিল না। কিন্তু বিগত তিন বছরে বিভিন্ন সময়ে হাতে গোনা হলেও কয়েকজন ক্রমাগত কবীরের প্রতীক্ষা করে গেছেন এবং আমাকে ঠেলে গেছেন যাতে আমি কবীরকে হাসপাতালের বিছানায় ফেলে রেখে এই কাহিনি শেষ না করি।

ক্রিস্টোফার নোলান একসময় বলেছিলেন, Every great story demands a great ending. কবীরের কাহিনি গ্রেট নয়, কিন্তু কবীরের প্রতি ভালোবাসায় কোনো খাদ নেই সেটুকু বলতে পারি। আমার মরচে পড়ে যাওয়া কলমে আমি চেষ্টা করেছি কবীরের জন্য, পাঠক-পাঠিকাদের কাছে বাধিত থাকব যদি তারা উপন্যাসিকাটি পড়েন এবং তাদের সুচিন্তিত মতামত আমাদের জানান।

সবশেষে ধন্যবাদ জানাই আমার বন্ধু অনিন্দ্য সান্যাল, চিত্রশিল্পী কুশল ভট্টাচার্যকে এবং খোয়াবনামার প্রকাশক রাজা পোদ্দারকে, এঁরা না থাকলে আমি কোনোদিন এই জগতে আসতেই পারতাম না। ধন্যবাদ জানাই পাঠক রাজা পাল এবং মানবেন্দ্র দেওয়ানজীকে যারা বছরের পর বছর নিকটাত্মীয়ের মতন কবীরের খোঁজ নিয়ে গেছেন। আমার কলম আপনাদের কাছে আজীবন ঋণী থেকে যাবে।

ধন্যবাদান্তে—
নীলাদ্রি মুখার্জী
বইমেলা, ২৩

অধ্যায়-১

(পর্দার ওপারে)

সময় বড় আশ্চর্য এক প্রবাহ, তার প্রবাহমানতার সাথে খেই রাখতে পেরেছে যে মানবজীবন, সুখী হয়েছে, যারা পারেনি তারা ভেসে গেছে। কেউ মনে রাখেনি তাদের, মনে রাখেনি তাদের কর্মকে। কর্ম বিস্মৃত হলেও, কর্মফল মুছে যায়নি কালের স্রোতে। বেনারসের দশাশ্বমেধ ঘাটে এক সাধু বহুবছর আগে আমাকে বলেছিলেন, সময়ের স্রোতে ধীরে ধীরে মা তার সন্তানের মৃত্যুশোক ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু সন্তানের অভাব থেকেই যায়। স্বয়ং মহাকালও সেই অভাব মেটাতে অক্ষম।

পাঁচতারা নার্সিংহোমের লবিতে বসে এসবই আগড়ুম বাগড়ুম ভেবে চলেছিলাম আমি। বাকিদের জন্য বিষয়টা কেমন জানিনা, আমার কাছে, বিশেষ করে আমার কাজের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা বেশ পুষ্টিকর। আমার যারা ক্লায়েন্ট তাদের

জন্য বিশেষ করে আমার মাঝে মাঝে এরম মগজ ঝালাইটা খুব প্রয়োজন। আমি যে কাজটা করি, সেটা একদিকে যেমন আজব অন্যদিকে তেমনি আরামপ্রদ। বেশীরভাগটা বসে বসেই কাজ, আর পেমেন্টও বেশ ভাল।

লবিতে লোকজনের মধ্যে একটা বেশ নড়াচরা লক্ষ্য করলাম। ঘড়ির দিকে তাকাতে বুঝলাম বিকেলের ভিজিটিং আওয়ার আসন্ন। দিনের এই সময়টাতে রোগীর বাড়ির লোকজনের মধ্যে বেশ একটা প্রতিযোগীতামূলক উত্তেজনা কাজ করে। কে আগে কার্ড নিয়ে ভিতরে যাবে, কে আগে বেরিয়ে এসে রোগীর হাল হকিকত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মতামত দেবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ডাক্তারের প্রেস্ক্রাইব করা ওষুধের কার্যকারিতা বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, নার্সিং হোমের হাইজিন, নার্স ইন্টারভেনাস দিতে গিয়ে নাক খুঁটেছেন কিনা তার পর্যবেক্ষণ, রোগী কদিনে বাড়ি ফিরবেন অথবা টেঁসে যাবেন এই সমস্ত বিষয়ে তাদের অসীম প্রজ্ঞা এবং ততধিক সক্ষমতা বাইরে প্রতীক্ষায় থাকা মানুষদের সামনে সেই প্রজ্ঞাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বর্ণনা করার।

রোগীর বাড়ির লোকের ভূমিকা এই সময় অনেকটা রাজনৈতিক দলগুলোর কোর কমিটির মতন। নির্বাচনের টিকিট দেওয়ার সময় যেমন অনেকগুলো ফ্যাক্টর মাথায় রেখে তবেই কোন প্রার্থীকে টিকিট দেওয়া হয় ঠিক এখানেও অতন্ত্য, ভেবে চিন্তে, জরিপ করে তারপর ভিজিটিং কার্ড দেওয়া হয় আগত দর্শনার্থীদের। কাকে দেখলে রোগী হাসবে, কাকে দেখলে প্রেসার বাড়বে, কে মোবাইলটা হাল্কা করে গুঁজে দিয়ে আসতে পারবে, কে নার্স ডাক্তারকে

চমকাতে পারবে, কে পরবর্তী কালে সব দেখেশুনে রোগীর অভিভাবকের দুর্নাম করবে না আরও কত ফ্যাক্টর মাথায় রাখতে হয়। আমার তো মাঝে মাঝে মনে হয়, বিধায়কের টিকিট দেওয়া বোধহয় নার্সিং হোমের ভিসিটিং কার্ড দেওয়ার থেকে ঢের সহজ কাজ।

যাই হোক, আমি রোগীর কাছে আসলেও আমায় ওসব ঝুটঝামেলায় পরতে হয় না। রোগীকে দেখতে আসে সাকুল্যে দুজন, রোগীর স্ত্রী আর তার ছেলে। দুজনেই মিনিট পাঁচেকের বেশী বুড়োর কাছে থাকে না, বলা ভালো থাকতে পারে না। বুড়ো মাঝে মাঝে ছেলে বৌকে আমার সামনেই এমন খেঁকানি দেয় যে আমি অপ্রস্তুতে হয়ে যাই। অবশ্য বুড়োর বৌ ছেলের তাতে কিছু আসে যায় বলে মনে হয় না, দীর্ঘদিন শুনতে শুনতে এবং বুড়োর ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার জন্যই বোধহয় হয় পাত্তা দেয় না নয়ত হজম করে নেয়।

গত পাঁচদিনের মতনই আজকেও ভিসিটিং আওয়ারসের দশ মিনিটের মধ্যেই আমার হাতে কার্ড চলে এল। ট্যাব, মোবাইল সব কিছু গুছিয়ে এগলাম কেবিন নং ৭০১-এর দিকে। নামে ৭০১ হলেও সাত তলার লবির একেবারে শেষের কেবিনটা দেওয়া হয়েছে নম্বরটাকে।

বৌ ছেলেকে ভাগিয়ে দিয়ে সুরুপ সুরুপ করে সুপ খাচ্ছিল বুড়ো। অমিতেন্দ্র রায় বর্মণ, বনেদি বাড়ির ছেলে, ঠাকুরদার আমলের জমিদারী ছিল ত্রিপুরাতে, তারপর ব্রিটিশ আমলেই ওনার পরিবার জমিদারি বেচে চলে এসেছিলেন কোলকাতায়। অমিতেন্দ্র সেকেন্ড জেনারেশন ব্যবসায়ী। ব্যবসা বলতে নিজের কিছুই না, বাবার দাঁড় করিয়ে দিয়ে

যাওয়া সোনার দোকান কিছু দক্ষ সৎ কর্মচারীর বদান্যতায় চলে। শহর জুড়ে গোটা বিশেক ফ্ল্যাট আর দোকানঘর, সেগুলোকে ভাড়ায় চরিয়ে যা উপার্জন হয় তাতে ব্যবসার টাকাতে হাত দিতে লাগে না। ব্যবসার টাকা সুদে বাড়ছে ব্যাঙ্কের ঘরে আর ভাড়ার টাকায় চলছে বিলাসবহুল জীবন।

তবে বিলাস বলতে মদ বা মেয়েছেলের তেমন নেশা এলোকের নেই। যদিও যেটা আছে তা নিয়মিত ভাবে চালাতে গেলে রেস্তর দরকার আছে বটে। আর সেই নেশা করতে গিয়ে প্রচুর বার প্রতারিত হয়েছেন, পয়সা লুটিয়েছেন জলের মতন। কিন্তু তার যে স্বপ্ন তা বোধহয় এতদিন পর বাস্তব হতে চলেছে।

সাহিত্যচর্চার নেশা ইদানীং কালে এই বঙ্গদেশে এক মারাত্মক নেশা। বাংলা বইয়ের বাজার যত নেমেছে তার সাথে উঠেছে লেখকসংখ্যার গ্রাফ। ঘরে ঘরে উপচে পরছে প্রতিভাবান লেখক লেখিকার দল। বইমেলাতে সবার বেরচ্ছে দু তিন খানা করে বই। ফেসবুক প্রোফাইল জুড়ে তাদের লেখালেখি সংক্রান্ত ব্যস্ততার কাহন, কখনো প্রকাশকের সাথে হ্যাদানোর বর্ণনা। এরাই আবার কখন নিজেদের মধ্যে চুলোচুলি করে মরছে আবার একসাথে নতুন প্রকাশনা সংস্থা, ফেসবুক গ্রুপ, লেখকসভা ইত্যাদি ইত্যাদি সংগঠন বানাচ্ছে।

আমার এক বান্ধবী বইমেলায় দাঁড়িয়ে বলেছিল, এরা নাকি আলাদাই এক আত্মশ্লাঘা অনুভব করে এটা বলতে যে তাদেরও প্রকাশক আছে, তাদেরও পাঠক আছে। এটা নাকি একরকম সামাজিক স্বীকৃতি, যা পেলে নাকি দশজনের থেকে একটু আলাদা হয়ে দাঁড়ান যায়। লোকের সামনে বলা যায়,

ওই আমি একটু আধটু লিখি, আমার জগতটা একটু আলাদা, আমি লেখাপড়া নিয়ে থাকি। সেটাই বা কম কি।

আর এই নেশারুদের জন্যই আমার ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আমি হলাম ভূত লেখক কাম প্রকাশক। ভূত লেখক মানে ঘোস্ট রাইটার, যে অন্যের হয়ে লিখে দেয় কিন্তু নাম যায় যিনি আমাকে পয়সা দিচ্ছেন তার। তিনি হন লেখক আর আমি হই তার ছায়া। লেখার দায়িত্বও আমার, ছাপারও আমার, বই বিক্রিরও আমার শুধু পয়সা দেওয়ার দায়িত্ব লেখকের থুরি মালিকের।

এই অমিতেন্দ্রর কাছে এসেছি সেই ছায়া হয়েই। দাদু এর আগে প্রায় পনেরোটি বই ছাপিয়েছেন, এবং পনেরোটিবারই বাঘা বাঘা প্রতারকের চক্করে পড়েছেন। প্রত্যেকেই দাদুর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে পাঁচ দশ কপি বই ছাপিয়ে নমস্কার করে ফুড়ুৎ হয়ে গেছেন। আমার একজন ক্লায়েন্ট দাদুর বন্ধু, কাজেই রেফারাল বেসিসে এই নতুন কাজটা আমি পেয়েছি।

অন্যদিনের মত আজকেও বুড়ো নতুন অধ্যায়ের সারসংক্ষেপটা আমাকে বলে দিচ্ছিলেন। আমি যদিও নোট করে নিচ্ছিলাম সবটাই কিন্তু মন পরেছিল কেবিনের পাশের বেডটাতে।

বুড়োর সাথে এই যে লোকটা ভর্তি আছে এখানে, আজ অবধি লোকটার মুখ দেখিনি। যখনই আসি তখনই বেডের পাশের পর্দাটা টানা থাকে। ভিসিটিং আওয়ারেও কোন লোক আজ অবধি দেখিনি। অমিতেন্দ্র খুব কথা বলতে ভালবাসে কিন্তু তাকেও তো কোনদিন লোকটার ব্যাপারে কিছু বলতে শুনিনি। শুধু একবার শুনেছিলাম লোকটা নাকি

কোমায় পরে আছে।

-কি ব্যপার? আজ তোমাকে একটু অমনোযোগী লাগছে

অমিতেন্দ্রর কথায় একটু চমকেই উঠলাম আমি, অমনোযোগী ছিলাম বলেই বোধ হয়। মুখে হাল্কা হাসি রেখে বললাম

-না সেরম কিছু না, আপনার পাশের বেডের লোকটির কি খবর। বেঁচে আছে না গেছে?

-সেসব জানিনা বাপু, এতদিনে লোকটার মুখই দেখতে পেলাম না। তবে মরে গেলে তো বডি নিতে আসত। সেসব কিছু দেখিনি।

-কোন ডাক্তার দেখছে?

-খেয়াল করিনি।

-দেখা করতে কেউ আসে না?

ভ্রূ কুঁচকে কিছু মনে করার চেষ্টা করলেন অমিতেন্দ্র। তারপর মাথা নাড়িয়ে বললেন

-তিনজন এসেছিল, একটা টেকো লোক আর দুজন পুলিশের লোক

-পুলিশের লোক বুঝলেন কি করে?

প্রশ্নটা শুনে একটু বিরক্ত হলেন অমিতেন্দ্র। খেঁকিয়ে উঠে বললেন

-আমার কিডনির অসুখ, চোখের তো মাথা খাই নি। পুলিশের পোশাকেই এসেছিল তাই জানলাম।

প্রসঙ্গ পাল্টে আবার নিজের লেখায় ফিরলেন অমিতেন্দ্র। আমিও আর কথা না বারিয়ে চুপচাপ নোট নিতে লাগলাম। তবে মনটা পরে রইল পর্দার ওপারে। আমার মনটা খচখচ

করতে লাগল ক্রমাগত, অমিতেন্দ্র যত সোজাভাবে বিষয়টা বর্ণনা করুন না কেন, বিষয়টা অতটা সোজাসাপটা নয়। ঝাপসা হয়ে যাওয়া পর্দার ওপারে রয়েছে এমন কিছু রহস্য যা না জানা অবধি আমার শান্তি নেই।

অধ্যায় : ২
(নম্বর : ৭০১)

এই ঘটনা যার কাছ থেকে শোনা তাকে সম্ভবত বেশ কিছু মানুষের চেনা। টাকমাথা, ভেতো বাঙালি সুলভ চেহারা। কতিপয় পাঠকের জবানিতে তিনি রায়বাবুর লালমোহন গাঙ্গুলির নকল, কেউ বা বলেন তিনি তার ব্যর্থ প্রচেষ্টা মাত্র। বাকিরা অবশ্য বলেন মানিকজোড়কে চেনার ক্ষমতা বা প্রজ্ঞা কোনটাই আমার নেই। তবে এই অধ্যায়ের বাকিটা তার মুখ থেকেই শোনা। শুধুমাত্র ভাষায় রূপান্তরিত করলাম আমি।

ইদানীংকালে সমীরবাবু আর নার্সিংহোমে জাননা। পর্দার ওপারের সেই অসীম নিস্তব্ধতা সহ্য করাটা আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। বার বার ডাক্তার বদল, ওষুধের হেরফের, ভিন্ন রকমের থেরাপি প্রয়োগ করে অথবা করার চেষ্টা করে করে তিনি ক্লান্ত। মাঝখানে কেটে গেছে তিন তিনটি বছর। সরকার থেকে বলা হয়েছিল সরকারী হাসপাতালে